যেসব খাবার দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখবে

শরীরের প্রতিটি অঙ্গের মতো দাঁত ও মাড়ির যত্ন নেয়া প্রয়োজন। কারণ দাঁত ব্যথা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। দাঁতের চিকিৎসাও ব্যয়বহুল।

তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে ও রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দাঁত ব্রাশ করতে হবে।
দাঁত পরিষ্কার রাখা, ফ্লসিং ও কুলকুচি ছাড়াও কিছু খাবার রয়েছে যা দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে দাঁত ও মাড়ি সুস্থ কীভাবে সুস্থ রাখবেন ও কী খাবার খাবেন যে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য জানা গেছে।

আসুন জেনে নেই যা খেলে দাঁত ও মাড়ি সুস্থ থাকবে-

১. দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখে। এসব খাবার ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। দুধে আছে ক্যাসেইন যা মুখগহ্বরের ক্ষরীয়ভাব নিষ্ক্রিয় করে। পনির দুধ-জাতীয় আরেকটি উন্নত খাবার যা মুখে লালার নিঃসরণ বাড়ায় এবং মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখে। দইয়ের প্রোবায়োটিক মুখ ও দাঁতের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

২. কপি-জাতীয় সবজি ও ফল খেতে হবে। এসব খাবার উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ তাই ভালো মতো চিবিয়ে খেতে হয়। এটা দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখে। এসব খাবারে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পাওয়া যায় যা সার্বিকভাবে শরীর ভালো রাখে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৩. কাঁচাপেঁয়াজ দাঁত ও মাড়ি ভালো রাখে। কাঁচাপেঁয়াজের গন্ধ অনেকেই পছন্দ করেন না। কাঁচাপেঁয়াজ নিয়মিত খেলে মুখের ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ দূর হয়। দাঁত এবং মাড়ি ভালো রাখতে সাহায্য করে।

৪. খাবার খাওয়ার পর প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে। খাবার কণা দাঁতের কোণায় আটকে থাকতে পারে ও ব্যাক্টেরিয়ায় সৃষ্টি হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করলে এসব আটকে থাকা খাবারের কণা দূর হয়ে যায় ও সংক্রমণের সৃষ্টি হয় না।

সুত্র-যুগান্তর

যেসব খেলনা শিশুর জন্য বিপজ্জনক

শিশুরা সাধারণত খেলতে ভালোবাসে। তবে সব খেলনা দিয়ে খেলা শিশুর জন্য নিরাপদ নয়। কিছু খেলনা রয়েছে শিশুর জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে।

কিছু খেলনা রয়েছে যা শিশুর জন্য নিরাপদ ও জ্ঞান উদ্দীপিত করে। ঝুমঝুমি ও বিভিন্ন আকার ও রঙবেরঙের খেলনা তাদের দৃষ্টির বিকাশ করে।

তবে কিছু খেলনা বা পণ্য আছে, যেগুলো শিশুদের জন্য বিপজ্জনক। তাই বিপজ্জনক খেলনাগুলো শিশুর হাতের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

আসুন জেনে নিই যেসব খেলনা শিশুদের জন্য বিপজ্জনক-

১. কিছু ছোট খেলনা আছে, যা ব্যাটারি দ্বারা চালিত। এই ধরনের খেলনা শিশুরা পছন্দ করলেও ঘটনাক্রমে কোনো খেলনা গ্রাস করে শিশুর শ্বাসরোধ হতে পারে।

২. তাড়াতাড়ি দাঁড়াতে ও হাঁটা শেখাতে বেবি ওয়াকার অনেকে।কিন্তু বেবি ওয়াকার দেখতে যতটা সহজ মনে হয়, সেটি ততটা নিরাপদ নয়। কারণ বেবি ওয়াকার দ্বারাও শিশু আঘাত পেতে পারে।

৩. খেলনার কোনো ছোট অংশ কোনো বাচ্চার নাক বা মুখের ভেতরে আটকে যেতে পারে। গাড়ির যন্ত্রাংশ বা পুতুলের বিভিন্ন অংশ থেকে শিশুকে দূরে রাখুন।

৪. ক্রিব বাম্পার শিশুর জন্য খুবই আরামদায়ক ও সুরক্ষিত। তবে এই নরম প্যাডগুলো শিশুর জন্য অনিরাপদ ও এটি শ্বাসরোধের কারণ।

৫. ঘুমানোর ধরন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের মতে, ঘুমের অবস্থান শিশুর পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে, যা শ্বাসরোধ ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলো দেখিয়েছে যে, ১৯৯৭ সাল থেকে কমপক্ষে ১৩টি শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেছে।

শিশুর জন্য নিরাপদ খেলনা

১. ১.৭৫ ইঞ্চি ব্যাসের কম হলে সেই খেলনা কেনা এড়িয়ে চলুন।

২. ব্যাটারিচালিত খেলনা এড়িয়ে চলুন।

৩. লম্বা হ্যান্ডেলসহ খেলনাগুলো কিনবেন না।

৪. ক্রিব টয়েজ ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন।

তথ্যসূত্র: বোল্ডস্কাই

ওজন কমাতে চান, খেয়ে দেখুন ৬ খাবার

অনেকে মনে করেন চর্বি খেলেই ওজন বাড়ে। তবে চর্বি খেয়ে যে ওজন কমানো যায়, তা আমরা অনেকেই জানি না। তবে স্বাস্থ্যকর কিছু চর্বি আছে যা ওজন কমায়।

পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন চর্বি খেয়ে কীভাবে ওজন কমানো যায় তা জানা গেছে।

আসুন জেনে নিই ওজন কমাতে সহায়তা করে এমন কয়েকটি চর্বির সম্পর্কে-

১. ওজন কমাতে খেতে পারেন পুষ্টিকর পনির। পনির ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি১২, ফসফরাস এবং সেলেনিয়ামসহ নানান পুষ্টি উপাদানে

ভরপুর। পনিরে আছে শক্তিশালী ফ্যাটি অ্যাসিড, যা টাইপ-টু ডায়াবেটিকের ঝুঁকি কমায়।

২. ডার্ক চকলেট আমাদের অনেকেরই প্রিয়, যা উচ্চ চর্বি, আঁশ, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, কপার ও ম্যাঙ্গানিজসমৃদ্ধ। ডার্ক চকলেট অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। তাই এই চকলেট রক্তচাপ, এলডিএল কোলেস্টের ও রক্তে অক্সিডাইজ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. খেতে পারেন ডিম। ডিমের কুসুম উচ্চ কোলেস্টেরল ও চর্বিযুক্ত। একটা সম্পূর্ণ ডিমে রয়েছে ২১২ মি.গ্রা. কোলেস্টেরল; কিন্তু গবেষণা অনুযায়ী ডিমের কোলেস্টেরল রক্তের কোলেস্টেরলে কোনো রকম প্রভাব রাখে না। এটি ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার।

৪. ওজন কমাতে চাইলে লবণ ছাড়া বাদাম খান। গবেষণা থেকে জানা যায়, যারা প্রতিদিন বাদাম খায় তাদের ওজন কম বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে।

৫. ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের অন্যতম উৎস সামুদ্রিক মাছ। ওমেগা থ্রি বাত জ্বর থেকে এবং রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইড কমাতে সাহায্য করে। এটা রক্তচাপ কমায়।

৬. দই প্রোবায়োটিক ব্যাক্টেরিয়া সমৃদ্ধ, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এতে দুধজাতীয় খাবারের মতো পুষ্টি উপাদান থাকে। নিয়মিত দই খাওয়া হলে তা ওজন ও স্থুলতা কমায়।

সুত্র-যুগান্তর

বসন্তে হতে পারে সংক্রামক অসুখ, কী করবেন?

বিদায় নিয়েছে শীত আর শুরু হয়েছে বসন্ত। এই বসন্তে হতে পারে নানাবিধ অসুখ। তাই এ বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।ঋতুর এই পরিবর্তন সহজে মানিয়ে নিতে পারে না শরীর। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক সবাই সংক্রামক আক্রান্ত হতে পারেন।

সামনের দিনগুলোতে গরমের প্রকোপ বাড়বে। আর তার সঙ্গেই তাল মিলিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠবে কিছু ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াও। তাই এই সময়ে শারীরিক সুস্থতার কথা মাথায় রেখে চলতে হবে। কারণ এই বসন্তে হতে পারে চিকেন পক্স, জ্বর, কাশি-সর্দির মতো রোগ।

এই সময়ে সবচেয়ে বাড়ে চিকেন পক্স। গরমে বাতাসে বহু পরিমাণে ভেসে বেড়ায় ভেরেসেলা জোস্টার ভাইরাস। ফলে সংক্রমণ ঘটতে পারে। এ ছাড়া ভাইরাল ফিভার, শ্বাসকষ্ট তো রয়েছেই।

কারণ এই সময়ে শরীরে পানির পরিমাণ কমে যায়। আর ক্যালোরিযুক্ত খাবারের ফলে কখনও কখনও কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগতে হয়, কখনও আবার ডায়েরিয়া হানা দিতে পারে।

আসুন জেনে নিই বসন্তে সুস্থ থাকতে কী করবেন-

১. বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে নিন। রাতের দিকে তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সঙ্গে একটা গরম পোশাক রাখুন।

২. বাড়িতে বা অফিসে কেউ ভাইরাল ফিভার, সর্দিকাশি ও সংক্রামক রোগে ভুগলে তার কাছ থেকে দূরে থাকুন।

৩. হালকা জ্বর বা গা ব্যথা হলে প্যারাসিটামল খান। অসুস্থ থাকলে চিকিত্সকের পরামর্শ নিয়ে নিন।

৪. প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন। ঈষদুষ্ণ পানিতে খুব ভালো করে রোজ গোসল করুন।

৫. মৌসুমি ফল ও সবজি খান। পরিমিত ফ্যাট, প্রোটিন, শাকসবজি ছাড়াও একটি করে মৌসুমি ফলকে খাবার পাতে রাখুন।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]?

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]-

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সুত্র-যুগান্তর

তারুণ্য ধরে রাখতে ঘরেই তৈরি করুন অ্যালোভেরা জেল

ঘর থেকে বাইরে বের হলেই ধুলাবালি ত্বকে জমে। ফলে ত্বক যেমন ময়লা হয়, তেমনি ত্বকে র্যাশও দেখা দিতে পারে। তবে ত্বকের যত্নে নামিদামি অনেক ক্রিম আমরা ব্যবহার করে থাকি।

তবে ত্বকের যে কোনো সমস্যায় ব্যবহার করতে পারেন অ্যালোভেরা জেল। আর এই অ্যালোভেরা জেল তৈরি করতে পারেন ঘরেই।

ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরা জেল খুব সহজেই তৈরি করা যায়। এই জেল ত্বকে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

রূপচর্চাবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে রাতে ত্বকের প্রাকৃতিক যত্ন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।

অ্যালোভেরা যে কোন ধরনের ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন। এই জেল ত্বক আর্দ্র রাখে ও ক্ষয় পূরণ করে। অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করলে ত্বক সুরক্ষিত রাখা যায়।

আসুন জেনে নিই কীভাবে ব্যবহার করবেন এই জেল-

উপকরণ অ্যালোভেরা জেল এক টেবিল চামচ, ল্যাভেন্ডার তেল এক চা চামচ, প্রিমরোজ তেল চার ফোঁটা।

যেভাবে তৈরি করবেন

সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে তা বায়ুরোধী কাচের পাত্রে সংরক্ষণ করুন। প্রতিদিন রাতে মুখ পরিষ্কার করে ঘুমানোর আগে এই জেল ব্যবহার করুন। ত্বকে তা ভালোভাবে প্রবেশ করানোর জন্য রোলার ব্যবহার করতে পারেন।

অ্যালোভেরা জেলের উপকারিতা

১. জেল ত্বকের ক্ষয় পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত তেল নিঃসরণ কমায়।
২. বাজারে যেসব ‘নাইট ক্রিম’ পাওয়া যায় তা রাসায়নিক দ্রব্য থাকে, যা ত্বকের জন্য ক্ষতিকর।

৩. প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এই জেলের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

সুত্র-যুগান্তর

জনপ্রিয় মিলিটারি ডায়েট প্ল্যান ‘কিটো ডায়েট’ কেন করবেন?

হঠাৎ করেই পৃথিবীজুড়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে মডার্ন মিলিটারি ডায়েট প্ল্যান ‘কিটো ডায়েট’ নিয়ে। বাংলাদেশেও এই নিয়ে কথা হচ্ছে। অনেকেই নানারকম ডায়েটের মধ্য থেকে কিটো ডায়েটকে বেছে নিচ্ছেন। কিটো ডায়েট নিয়ে মানুষের মধ্যে উত্তেজনাটা যেন একটু বেশিই।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই কিটো ডায়েট করে নিজের আমূল পরিবর্তন করেছেন বলে জানাচ্ছেন অনেকেই। দেশে ইউটিউব-ফেসবুকে তুমুল জনপ্রিয় ডা. জাহাঙ্গীর কবিরের নানান ডায়েট প্ল্যানের কারণে এ বিষয়টি আরও বেশি জড়ালোভাবে সামনে এসেছে।

কিটো ডায়েট কী?

কিটো ডায়েটে মূলত কার্বোহাইড্রেটকে এড়িয়ে চলা হয়। আমাদের শরীরে যে জমাট ফ্যাট থাকে, কোনো কাজের সময় শরীর সেটাকে পোড়ায় না। তুলনামূলকভাবে চর্বি পোড়ানো সহজ হওয়ায় কাজের ক্ষেত্রে শরীর প্রথমে চর্বিকেই পোড়ায়।

ফলে, এই কার্বোহাইড্রেট আমাদের শরীরে জমাট বেঁধে স্থূলতা তৈরি করে। কিটো ডায়েটের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটকে পুড়িয়ে ফেলা। চর্বি পোড়ানো শেষ হয়ে গেলে শরীর জমানো কার্বোহাইড্রেট পোড়ানো শুরু করবে এবং এতে করে ওজন কমে যাবে এটাই হলো সহজ যুক্তি।

কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাবার ভাত, যার ৯০ ভাগই কার্বোহাইড্রেট। অর্থাৎ আমাদের শরীর কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাদ্যতে অভ্যস্ত। এটি শরীরের ওজন বাড়িয়ে দেয়। খাদ্য কিটোজেনিক ডায়েটের মূল ফর্মুলা কার্বোহাইড্রেটকে বাদ দিয়ে ফ্যাট আর প্রোটিনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটির জন্য বেশ কয়েকটি চিত্তাকর্ষক সুবিধার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যসহ ওজন কমানোর। অতএব, ওজন কমানোর লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেকেই কিটো ডায়েটে ফিরে যান।

আমাদের শরীরের প্রধান খাদ্য বা জ্বালানি হলো গ্লুকোজ। কিন্তু যদি কোনো কারণে গ্লুকোজ শেষ হয়ে যায় তবে দেহ একটি বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করে। সেই বিকল্প জ্বালানিগুলোকে বলা হয় কিটোন বডি। কিটোন বডি থেকেই এসেছে কিটোজেনিক ডায়েট। কিটোন বডির মধ্যে রয়েছে- এসিটোন, এসিটো-এসিটিক এসিড এবং বিটা-হাইড্রক্সি-বিউটারেট।

আমরা যখন কিটো ডায়েট করি তখন আমাদের প্রধান টার্গেট থাকে গ্লুকোজের বদলে কিটোন বডিগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা। এখন প্রশ্ন হলো, কিটোন বডি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলে কিভাবে ওজন কমবে? এই কিটোন বডিগুলো তৈরি হয় আমাদের ফ্যাটি টিস্যু ভাঙনের ফলে। সুতরাং আপনি যখন কিটোসিসে চলে যান অন্যভাবে বললে শরীরে গ্লুকোজ সাপ্লাই বন্ধ করে দেন তখন শরীর তার বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করার জন্য ফ্যাটি টিস্যু ভাঙ্গা শুরু করে দেয়।

কিটো ডায়েট হল সুপার লো-কার্ব ডায়েট। এই ডায়েটে কার্ব এক্সট্রিম লেভেলে কম থাকবে আর ফ্যাট অনেক হাই থাকবে আর প্রোটিন মিড লেভেলে থাকবে। টিপিক্যাল কিটোজেনিক ডায়েটে টোটাল

ক্যালোরিক নিডের কার্ব ৫%, প্রোটিন ২৫% আর ফ্যাট থাকে ৭০%।

মানে আপনি সারাদিন যতটা খাবার খাবেন তার মধ্যে খাবারের পার্সেন্টেজ এমন হবে। আমাদের নরমাল ডায়েটে ৫০% কার্বোহাইড্রেট থাকে, ২০%প্রোটিন আর ৩০%ফ্যাট থাকে। ধরা যাক আপনি ১২০০ ক্যালরি খাবেন সারাদিনে। তার ৫০% কার্ব মানে আপনাকে ৬০০ক্যালরির কার্ব খেতে হবে।

কিটো ডায়েট কিভাবে কাজ করে?

অনেক পুষ্টিবিদ অনেকভাবে এটাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সবাই একটাই কথা বলেছেন, কার্বোহাইড্রেটকে বাদ দিয়ে ফ্যাট আর প্রোটিন খাও। সর্বজনস্বীকৃত একটা ফর্মুলা আছে। সেটা হলো- ৬০% ফ্যাট + ৩০% প্রোটিন + ১০% কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট।

কিটো ডায়েট অনেক ইফেক্টিভ ফ্যাট লস ডায়েট। এখানে ফ্যাটটিকেই টার্গেট করা হচ্ছে। ফ্যাট তো হলো বডির স্টোর্ড এনার্জি যা দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। তো আমরা সেই ফ্যাটকে এনার্জি হিসেবে ব্যবহার করবো, কারণ কিটোতে কার্ব একদম বাদ দিয়েছি আমরা।

যখন ফ্যাট বার্ন হবে তখন আপনার ওয়েট লস বা ফ্যাট লস হবে, কেন কারণ কিটোতে আপনার ফ্যাট সেল বার্ন হচ্ছে। এখানে প্রোটিন জরুরি কারণ বডি যখন কিটোসিস এ যায় তখন ফ্যাটের সাথে কিছু মাসল ও বার্ন করতে পারে, সেটা যেন না হয় বা কম হয় তাই প্রোটিন রাখা হয়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে ফ্যাট এত বেশি খাবার প্রয়োজন কি?

কিটো ডায়েটে আমরা মেইনলি প্রোটিন খাব, শুধুমাত্র প্রোটিন থেকে ডেইলি ক্যালরি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করা যাবে না। তাই আমাদের ফ্যাট দরকার সেই ক্যালরির চাহিদা পূরণ করার জন্য। জেনে রাখা ভালো ফ্যাট, কার্ব আর প্রোটিনের চেয়ে ২.৫ গুণ বেশি ক্যালরি থাকে।

বেশি ক্যালরি বা ক্যালরির ঘাটতিতে যাওয়া যাবে না। কারণ তখন আপনার বডি ঠিকমত ফাংশন করবে না। সেটা আর হেলদি ডায়েট থাকবে না। টোটাল ক্যালরি নিডের মাত্র ২০-৩০% প্রোটিন আর ৫% কার্ব বাকিটা ফ্যাট দিয়ে চাহিদা পূরণ করতে হবে। কিটো ডায়েটে আমরা ফ্যাট খাব ফ্যাট বার্ন করার জন্য।

কিটো ডায়েট চার প্রকার

১. স্ট্যান্ডার্ড কিটোজনিক ডায়েট: এটাতে কার্ব ৫%, প্রোটিন ২৫ % আর ফ্যাট ৭০% থাকে।

২. সাইক্লিক্যাল কিটোজনিক ডায়েট: এই কিটো তে সপ্তাহে দুদিন হাই কার্ব খাওয়া যায়।

৩. টার্গেটেড কিটোজনিক ডায়েট: এই কিটোতে ওয়ার্ক আউটের আগে বা পরে কার্ব খেতে পাওয়া যায়।

৪. হাই প্রোটিন কিটো ডায়েট: এটা অনেকটা স্ট্যান্ডার্ড কিটো ডায়েটের মতোই, শুধু প্রোটিন ২৫% থেকে বেড়ে ৩৫% হয়ে যায়। এটাতে ফ্যাট ৬০%, প্রোটিন ৩৫% আর ফ্যাট ৫%. বডি বিল্ডার বা এথেলেট রা এটা করে থাকে।

কিটো ডায়েট: যেসব খাবার খেতে পারবেন না

চিনি বা মিষ্টিজাতীয় কোনো কিছু একদম বাদ। কোক, ফলের জুস, কেক, আইসক্রীম, চকলেট, স্মুদি, যেকোনো ধরনের মিষ্টি।

আটার তৈরি কোনো কিছু, ভাত, পাস্তা, নুডলস, ওটস, কর্ন ফ্লেক্স সব বাদ।

সব ধরনের ফল নিষেধ।

সব ধরনের ডাল নিষেধ, ডালে প্রোটিনের পাশাপাশি ভালো পরিমাণ কার্ব থাকে।

মাটির নিচে হয় এমন সব সবজি যেমন: আলু, মুলা, গাজর, কচু সব বাদ।

যে কোনো ধরনের প্রক্রিয়াজাত খাবার একদম বাদ।

কিটো ডায়েট: যেসব খাবার খাওয়া যাবে

* মাংস: গরু, মুরগি

* সব ধরনের মাছ

* ডিম

* বাটার

* বাদাম

* হেলদি ওয়েল– যেমন অলিভ ওয়েল, কোকনাট ওয়েল, ক্যানলা ওয়েল

* ঘি

* সবুজ যে কোনো সবজি, পালং, ব্রকলি, বাঁধাকপি এসব।

* মোটামুটি সবধরনের মশলা।

যে কারণে কিটো ডায়েট ভাল

অল্প সময়ে প্রচুর ফ্যাট কমানো যায়।

ফ্যাট আর প্রোটিন খাবেন তাই পেট খালি থাকবে না।

শরীরে পেশীর পরিমাণ কমবে না কিন্তু মেদ কমে যাবে।

অনেক বেশি প্রোটিন থাকাতে সহজে ক্ষুধা লাগবে না। আপনি সহজে ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন।

এক গবেষণাতে দেখা গেছে, কিটো ডায়েট করা মানুষ টিপিক্যাল লো- ফ্যাট ক্যালরি রেস্টিক্টেড ডায়েটের চেয়ে ২.২ গুণ বেশি ওজন কমিয়েছে।

কিটো ডায়েট হার্ট ডিজিজ, ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগারের রিস্ক কমায়।

পিসিওএস রোগীদের জন্য ইফেক্টিভ ডায়েট।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অনেক ইফেক্টিভ একটা ডায়েট, শুধু ওজন কমানো না ব্লাড সুগার আর ইনসুলিন লেভেল নিয়ন্ত্রণে আনে।

যে কারণে কিটো ডায়েট ভাল না

* কার্ব কম হবার কারণে বডি পানি কম হোল্ড করে। তাই শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যায়। প্রতি ১ গ্রাম কার্ব ৩ গ্রাম পানি হোল্ড করে। তাই বডিকে হাইড্রেটেড রাখতে বেশি পানি খেতে হবে। দিনে ৩-৪ লিটার মিনিমাম। পানি আর মিনারেলের ঘাটতি কমাতে দিনে ১.৫ -২ চা চামচ লবণ সারাদিনের খাবারে খেতে হয়।

* হোল গ্রেইন ফুড বন্ধ থাকার কারণে ফাইবার কম হবে। আর ফাইবার কম হলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হবে। সবুজ শাক-সবজি, বাদাম, সাথে রাতে ঘুমানোর আগে ১-২ চা চামচ ইসবগুল এক গ্লাস পানিতে মিশিয়ে

খেলে অনেকটা সমস্যা কমে যায়।

* কিটো ফ্লু: কিটো ডায়েটের মূল সমস্যা এটা। এক্সট্রিম লেভেলে বডিকে নিয়ে যেতে অনেক মেন্টালি স্ট্রং হতে হবে। নরমাল ডায়েট থেকে কিটো ডায়েটে গেলে শরীরে একটা মেটাবলিক সিফট হয়। এটাকেই কিটো ফ্লু বলে। কিটো ফ্লুতে আপনার বমি বমি ভাব হবে, কাশি হতে পারে, ক্লান্তি আসতে পারে, মাথা ব্যথা হতে পারে। ওয়ার্কআউট করলে এটা খুব বেশি থাকে না। আর নরমালি ৪-৫ দিন কিটো ফ্লু এর ইফেক্ট থাকে, তারপর আর সমস্যা নাই।

* ফল আর গ্রেইন ফুড সব বন্ধ করার কারণে শরীর সব ধরনের ভিটামিন, মিনারেল পাবে না সেজন্য আপনাকে মাল্টিভিটামিন সাপ্লিমেন্ট খেতে হবে সে ঘাটতি পূরণের জন্য। দিনে ১ টা ভিটামিন সি আর একটা মাল্টিভিটামিন ক্যাপসুল খেতে হবে।

* কার্বোহাইড্রেট বডিকে ইনস্ট্যান্ট এনার্জি প্রোভাইড করে। যেহেতু কার্ব কম থাকবে তাই আপনি কম এনার্জেটিক ফিল করবেন। কার্ডিও টাইপ ওয়ার্কআউট করতে সমস্যা হবে। সব ওয়েটলস ডায়েটে কিছুটা এনার্জি লস হয়।

কিটো ডায়েট সম্পর্কে জরুরি কিছু তথ্য

ভেজিটেরিয়ানদের জন্য কষ্টকর: আপনি যদি শুধু শাক-সবজি খেয়ে থাকেন তাহলে কিটো ডায়েট আপনার জন্য বেশ কষ্টকর ব্যাপার হবে। কারণ, কিটো ডায়েটে প্রোটিন খুব কম পরিমাণে গ্রহণ করতে হলেও শাক-সবজি থেকে সেই প্রোটিন পাওয়াটা খুব কঠিন ব্যাপার। এছাড়া, সবজিতে আপনি প্রোটিনের সঙ্গে সঙ্গে শর্করাও পাবেন। এটিও আপনার ডায়েটে বিঘ্ন তৈরি করতে পারে।

অতিরিক্ত প্রোটিন নয়: আপনার হয়তো মনে হতেই পারে যে, কিটো ডায়েট মানেই প্রচুর পরিমাণ মাংস গ্রহণ করা। বাস্তবে ব্যাপারটি একেবারেই এমন নয়। কিটো ডায়েটের ক্ষেত্রে ক্যালোরির উৎসকে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ৭৫ শতাংশ ফ্যাট, ২০ শতাংশ প্রোটিন এবং ৫ শতাংশ কার্ব- মোট মিলিয়ে এভাবেই কিটো ডায়েট সাজানো হয়। এর অর্থ, আপনি যখন স্টেক খাচ্ছেন তখন আপনাকে স্টেকের মাংস বেশি নয়, খেতে হবে মাখন ও নারিকেল তেলের মতো ফ্যাট। তাই আপনি যদি শুধু মাংস খাওয়ার জন্যই কিটো ডায়েট করে থাকেন তাহলে চিন্তাটি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন।

কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে: সাধারণত, আমরা শর্করাজাতীয় খাবার থেকেই আঁশ পেয়ে থাকি। এতে করে আমাদের খাবার হজম থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজগুলো সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু, আপনি যদি কিটো ডায়েট বেছে থাকেন তাহলে আপনি এই দরকারি আঁশটুকু পাবেন না এবং আপনার কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দেখা দেবে। আপনার যদি কোনো শারীরিক সমস্যা থাকে বা হজমে সমস্যা থেকে থাকে, তাহলে কিটো ডায়েট অনুসরণ না করার সিদ্ধান্তটাই সবচাইতে সঠিক হবে।

কিটোর ডায়েটের সঠিক উদ্দেশ্য: এখন হয়তো কিটো ডায়েটকে ওজন কমানোর উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু আসলে এই ডায়েটের শুরুটা হয়েছিল কীভাবে তা কি জানেন? ওজন কমানো নয়, সিজার সংক্রান্ত নানারকম শারীরিক সমস্যা দূর করার জন্য এই ডায়েট ব্যবহার করা শুরু হয়। বাচ্চাদের মধ্যে এপিলেপ্সি ও এমন অন্যান্য ডিজঅর্ডার সারিয়ে তুলতে প্রায় এক শতক আগে কিটো ডায়েট তৈরি করা হয়।

ফল মানেই ‘না’: কিটো ডায়েটে আপনি ফল খেতে পারবেন না খুব একটা। সাধারণত, অন্যান্য ডায়েটে ফলের জায়গাটুকু থাকলেও কিটো ডায়েটে সেটা প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ, ফলে প্রচুর পরিমাণ শর্করা থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আপনি কিটো ডায়েটে মাত্র ২০ গ্রাম শর্করা গ্রহণ করতে পারবেন। অন্যদিকে, একটি বড় আপেল থেকেই ২৫ গ্রাম শর্করা পাবেন আপনি। তাই, আর যাই হোক, কিটো ডায়েটে ফল খেতে হবে খুব বেছে!

সতর্কতা

বাংলাদেশের মানুষদের কিটোজেনিক ডায়েট বেশি দিন টানা করা ঠিক নয়। সুষম খাদ্যাভ্যাসই সবচেয়ে সেরা উপায়। তবে পরিকল্পিতভাবে যে কোনো ধরনের ডায়েটই আপনার কাজে আসতে পারে। ডেইলি ইউএস টাইমস কিটো ডায়েট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। সেখানে সাপ্তাহিক প্ল্যানও রয়েছে। চাইলে সেটা অনুসরণ করতে পারেন। এছাড়া অন্য যেকোনো বিশেষ ধরনের খাদ্য পরিকল্পনা অনুসরণের আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

সুত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

নতুন স্মার্টফোনে যুক্ত হচ্ছে ই-সিম

নতুন স্মার্টফোনে যুক্ত হচ্ছে ই-সিম। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে গ্রাহকদের মধ্যে চলছে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা।

সাধারণ স্মার্টফোন কেনার পর গ্রাহক নিজের পছন্দসই সিম ব্যবহার করতে পারেন। এসব সিম মূলত চিপযুক্ত প্লাস্টিক দিয়ে বানানো। আর সিম ছাড়া স্মার্টফোনের কোনো ফাংশনই কাজ করে না। আর সিমযুক্ত করলেই কেবল ফোন নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হতে পারে।

আর এসব প্লাস্টিক সিম ব্যবহার না করে কীভাবে নেটওয়ার্কের আওতায় থাকা যায়, সেই ভাবনা থেকে এবার নতুন স্মার্টফোনে যুক্ত হচ্ছে ই-সিম।

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের স্মার্টফোনে যুক্ত করা হচ্ছে ই-সিম। এ তালিকায় রয়েছে- আইফোন এক্সএস, এক্সএস ম্যাক্স, এক্সআর, ১১, ১১ প্রো এবং ১১ প্রো ম্যাক্স। আইফোনের বাইরে গুগল পিক্সেল ২, ৩, ৩এ, ৪ মডেলেও যুক্ত করা হয়েছে এটি। এ ছাড়া স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোল্ড মডেল, মটোরোলা রেজর, স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২০, এস২০ প্লাস মডেলে থাকছে ই-সিম।

আধুনিক স্মার্টফোন গবেষকেরা জানিয়েছেন, ই-সিম মূলত ‘এমবেডেড সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল’। এটি ছোট একটি ইলেকট্রনিক চিপ,

যার সাহায্যে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা নতুন কোনও সিম ছাড়াই প্রাথমিক নেটওয়ার্ক খুঁজে পাবেন।

এই সিমে আলাদা কোনও সিম ট্রে থাকছে না। এটি বিল্ট-ইন অবস্থায় স্মার্টফোনেই থাকছে।

নতুন ই-সিম যুক্ত করে গ্রাহক যখন নতুন স্মার্টফোন চালু করবেন, তখনই তিনি কোন নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করবেন তা জানতে চাওয়া হয়। তখন ব্যবহারকারী যদি কোনো সিম ব্যবহারের কথা না জানাতে পারেন, তবে ই-সিম নির্বাচন করেই স্মার্টফোনটি সক্রিয় করা যাবে।

তথ্যসূত্র: সিনেট, গুগল পিক্সেল

মেপ্র/আরজেএম

চিকেন পক্সের রোগীকে কী খাওয়াবেন?

চিকেন পক্সে এক সময় অনেক মানুষের মৃত্যু হতো। ছোঁয়াচে এ রোগ সারা বছর দেখা গেলেও বসন্তের শুরুতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। চিকেন পক্স অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, হাঁচি-কাশি এবং ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মাধ্যমেই এটি বেশি ছড়ায়।

এ রোগে আক্রান্ত হলে আলাদা একটি ঘরে রাখা উচিত। ব্যবহৃত পোশাক, গামছা যাতে অন্য কেউ ব্যবহার না করে সেদিকে খেয়াল রাখুন। পক্স

ভালো হয়ে গেলেও ব্যবহৃত সব কাপড়-চোপড়, বিছানার চাদর, তোয়ালে গরম পানি এবং স্যাভলন দিয়ে ধুয়ে দিন।

সাধারণত ভাইরাস সংক্রমণের ১০ থেকে ২১ দিন পর শরীরে চিকেন পক্সের লক্ষণ দেখা দেয়।

আসুন জেনে নেই চিকেন পক্স প্রতিরোধ করবে যেসব খাবার-

বিশেষজ্ঞদের মতে, চিকেন পক্স থেকে বাঁচতে হলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সকালে খালি পেটে কাঁচা হলুদের রস খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এছাড়া যেকোন ধরনের সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করতে শরীর উপযোগী হয়।

বিশেষজ্ঞরা আরও জানান, এ সময় প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার পেঁয়াজ, কলা, রসুন খেতে পারেন।

পুষ্টিবিদরা জানান, চিকেন পক্সে আক্রান্তরা এক চামচ মধুর সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়া মিশিয়ে খেতে পারেন। পক্স হলে শরীরে পানির চাহিদা দেখা দেয়। তাই আর্দ্রতা বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন। ফলের জুস, বাটার-দুধ, লাচ্ছি এবং স্যুপ খেতে পারেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সময় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি অ্যান্টব্যাকটেরিয়াল সমৃদ্ধ কাঁচা পেঁপে খেলে ভালো উপকার পাওয়া যায়। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিম্যালারিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল সমৃদ্ধ নিম পাতা চিকেন পক্স নিরাময়ে খুব ভালো কাজ করে। তাজা নিম পাতার রস খেলে উপকার পাওয়া যায়। নিম সিদ্ধ পানি দিয়ে রোগীকে গোসল করাতে হবে।

রোগী মাছ-মাংস, ডিম-দুধ সবই খাবে। পুষ্টিকর খাবার খেলে রোগ আরোগ্য সহজ হবে।

চুলকানির জন্য এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ এবং যাতে অন্য কোনো ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ না ঘটে সেজন্য অ্যান্টিস্যাপ্টিক দেয়া যেতে পারে। জ্বর, গা ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল এবং সারা শরীরে লোপিও ক্যালাসিন লোশন লাগানো যায়।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

□□□□□/□□□□□□